আছে লক্ষ মাইল ওয়ে

হতাশামুক্ত জীবনের খোঁজে

বই	**আই লস্ট মাই ওয়ে**
লেখক	ইয়াসমিন মুজাহিদ
ভাষান্তর	সানজিদা সিদ্দিকী কথা
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন টিম
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

আই লস্ট মাই ওয়ে

হতাশামুক্ত জীবনের খোঁজে

ইয়াসমিন মুজাহিদ

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

আই লস্ট মাই ওয়ে

ইয়াসমিন মুজাহিদ

প্রকাশকাল : বইমেলা ২০২১

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামী টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন

ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ

www.wellreachbd.com
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, শপ নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৩ ৫১ ৯১

অথবা **rokomari.com** & **wafilife.com**-এ

বইমেলা পরিবেশক

বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ১৩২, US $ 8, UK £ 5

I LOST MY WAY

Writer : Yasmin Mogahed
Translated : Sanjida Siddiqui Kotha

Published by
Muhammad Publication
Islami Tower, 2nd Floor, Shop = 42
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95222-3-2

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

হতাশাগ্রস্তদের হতাশা মুক্তি কামনায়...

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আমাদের অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। দেখিয়েছেন সরল-সঠিক পথ। যাকে বলা হয় 'সিরাতল মুস্তাকিম'। যে পথে রয়েছে চিরশান্তি, রবের সন্তুষ্টি। দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা।

কিন্তু দুনিয়ার চোরাবালিতে আমরা সে পথ হারিয়ে ফেলি। হারিয়ে যাই অন্ধকারের অতলে। হতাশা ও বিষণ্নতায় ছেয়ে যায় পুরো জীবন। নিমিষেই শেষ করে ফেলি নিজেকে।

কিন্তু কেন; পথহারা কি পেতে পারে না সঠিক পথের দিশা? কী সেই পথ? কীভাবে পাব আলোর দিশা?

মিশরের প্রতিথযশা লেখিকা ইয়াসমিন মুজাহিদ রচিত 'আই লস্ট মাই ওয়ে' ও 'শ্যাটারড গ্লাস' বই দুটির অনূদিত রূপ 'আই লস্ট মাই ওয়ে' গ্রন্থটি আপনাকে দেখাবে সঠিক পথ। শোনাবে হতাশামুক্ত জীবনের নানা কথা-চিকিৎসা।

বইটি ভাষান্তর করেছেন সানজিদা সিদ্দিকী কথা। শ্রদ্ধেয়ার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। নানা ব্যস্ততার মাঝেও এমন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটি আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য। আশা করি তার ঝরঝরে অনুবাদ অবশ্যই পাঠককে মোহিত করবে।

সবশেষে বলব, আমাদের কাজের যা কিছু ভালো তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আর যা অসুন্দর বা ভুল তা আমাদের সীমাবদ্ধতা থেকে। তাই যদি কোনো অসংগতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেব। ইনশাআল্লাহ।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
মার্চ ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

সূচিপত্র

হারিয়েছি পথ
[প্রথম পর্ব]

আবেগপূর্ণ চিকিৎসা, প্রথম পর্যায় ১৩
নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ১৬
আমরা কী করি ১৮
রোগপ্রতিরোধ—চিকিৎসার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ৩৫
মৃত্যুময় ক্ষতির জন্য বিধান ৩৮
ভাঙা হৃদয়ের জন্য নসিহত ৪১
আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন ৪৪
উপসংহার ৪৬

হারিয়েছি পথ
[দ্বিতীয় পর্ব]

আল্লাহর ওয়াদা ৫১
আত্মকেন্দ্রীক চিন্তা বাদ দিন ৫৩
আশা ৫৭
ভাবনার উপায় ৬১
সুখ ৬৯
আপনার একজন দর্শক আছে ৭৩
কৃতজ্ঞতা ৭৭
একজন সমস্যা সমাধানকারী ৭৯
উপসংহার ৮৮

হারিয়েছি পথ

[প্রথম পর্ব]

আবেগপূর্ণ চিকিৎসা, প্রথম পর্যায়

এ এমন একটি বিষয়, যাকে কেন্দ্র করে অসম্ভব উদ্দীপনা ও জোশ তৈরি হয়েছে আমার ভেতর এবং আমার মনে হয়, এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের সাগ্রহে কথা বলা শুরু করা উচিত। প্রয়োজনে সুচারু প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের পরিচর্যা আমরা নিজেরাই করতে পারি। আর এ হলো আবেগময় চিকিৎসার একেবারে প্রথম পর্যায়।

মানুষ হিসেবে, একটা জাতি-গোষ্ঠী হিসেবে আমরা মুসলিম-অমুসলিম উভয়ই কীভাবে ভাঙা পা-কে সারিয়ে তুলতে হয়, সেটা খুব ভালো করেই জানি। আমরা আলবৎ জানি যে, কীভাবে একজন বন্দুকের গুলিতে আহত ব্যক্তিকে চিকিৎসা নিতে হয়। কিন্তু কীভাবে একটি ভাঙা হৃদয়কে সারিয়ে তুলতে হয়, সেটা নিয়ে না আছে আমাদের মাথাব্যথা আর না জানি আমরা কোনো নিয়মরীতি।

মানসগত অভিঘাত এমন একটি বিপর্যয়, মানবজাতি হিসেবে যা আমাদেরকে অন্ধ খোঁড়া বানিয়ে ফেলেছে। আমরা শেখাই না, এবং তার জন্য নেই আমাদের কোনো সরঞ্জামও। এ ছাড়াও আমাদের ভাঙা হৃদয়ের উপশমের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাময় প্রক্রিয়াটিকে আমরা সাধারণত খুব একটা সমর্থনও করি না।

কেউ যদি তার পা ভেঙে ফেলে, তাহলে অন্যরা তাকে বলবে না, 'কিছুই হয়নি তো, হেঁটে চলো বাপু'। পা-খানি ভেঙেছে যার, আপনি তাকে কখনোই হাঁটতে বলবেন না; বলতে পারেন না। কারণ, আপনি জানেন ভাঙা পায়ের চিকিৎসার কিছু প্রক্রিয়া আছে। তাকে আবার আগের মতো হাঁটাচলা করার জন্য চিকিৎসার এই ধাপগুলো সেরে আসতে হবে।

দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মানসিক ক্ষত, মনোগত আঘাত এবং ভাঙা হৃদয়ের প্রতি সমপরিমাণ সহানুভূতি এবং বোধগম্যতা—কোনোটাই নেই আমাদের। আমরা মানুষের কাছ থেকে যে অভিব্যক্তি পাই, তা অনেকটা এমনই যে, হ্যাঁ, তারা থেমে যাক না।

তাদের সময়ের সীমা চলে এসেছে। এবং অবশ্যই এই সময়সীমাটি নির্ধারণ করে কে? মানুষই সেটা নির্ধারণ করে।

আমি মনে করি যে, এই জিনিসগুলো শেখা এবং শেখানো আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে শামিল। এ ছাড়া শুধু আমাদেরকেই শেখানো এবং প্রশিক্ষণ নয়, এসবের তালিম-তারবিয়ত এবং শেখন বা ইসলাহ-প্রক্রিয়া আমাদের প্রজন্মান্তরের মধ্যেও ছড়িয়ে দিতে হবে। এটা আমাদের পরবর্তীকালের জেনারেশনের মনোপাঠ্যেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কীভাবে খাদের কিনারে পড়ে যেতে যেতেও সেখান থেকে উঠে দাঁড়াতে হয়, তার সঠিক পদ্ধতি জানাটা অত্যন্ত জরুরি। দুর্ভাগ্যবশত আমরা যেভাবে শিখি, তা হলো—'কোনোদিনও পড়ে যাব না, সারাজীবন চলতেই থাকব।' এটা খুব একটা কার্যকর বা বাস্তবোচিত কোনো প্রক্রিয়া নয়, হতে পারে না।

অবশ্য আপনার যদি একজন অলিম্পিক প্রশিক্ষক থাকে, যে তার অনুসারী ও খেলোয়াড়দের বলে, 'কখনোই পড়ে যাবে না', তাহলে ব্যাপারটা নিতান্ত বাস্তবতাবিরোধী রূপেই বিবেচিত হবে। অবশ্য পড়ে না যাওয়াটাই লক্ষ হবে। কিন্তু কাউকে এটা বলা, 'কখনোই পড়ে যাবে না' এবং তাদেরকে এই প্রশিক্ষণ না দেওয়া যে, 'পড়ে গেলে কী করবে'—সে কখনোই একজন ভালো প্রশিক্ষক হতে পারে না।

কারণ, এটাই বাস্তবতা যে, একজন অ্যাথলেট যতই ভালো হোক না কেন, যতই বুদ্ধিমান অলিম্পিক অ্যাথলেট হয়ে থাকুক না কেন, একটা সময় আসবে যখন সে পা ফসকে পড়ে যাবে।

তাদের জীবনে একটা সময় আসবে, যখন তাদের শারীরিক সামর্থ্য স্খলিত হবে। উত্তম প্রশিক্ষক তো সেই, যে তার খেলোয়াড়দের এটা শেখাবে যে, কীভাবে দৃঢ়চিত্তে উঠে দাঁড়াতে হয়। আপনি কখনো এমন কাউকে দেখেছেন, যে প্রতিযোগিতা করছে অথবা কাজ করছে কিন্তু হঠাৎ করেই হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছে?

তারা আবার দুর্বার শক্তিতে উঠে দাঁড়ায়। আপনি কোনো শারীরিক কসরতকারীকে দেখেছেন, যখন তারা পড়ে যায়, তখন কি তারা শুধু বরফের মধ্যে অথবা মাটিতে পড়ে থাকে? কেউ এটা করে না। তারা চটজলদি উঠে দাঁড়ায় এবং নতুন করে পথ চলতে শুরু করে। এটি তাদের প্রশিক্ষণের একটি অংশ। এটি আমাদেরও প্রশিক্ষণের এবং অনুধাবনের অংশ হওয়া দরকার।

জীবনটা নিখুঁত নয় এবং মানুষও নিখুঁত নয়। এটা একেবারেই অসম্ভব যে, আমরা জীবনে চলতে থাকব এবং কখনোই পড়ে যাব না। এটা একেবারেই অসম্ভব যে, আমরা কখনোই ভেঙে পড়ব না অথবা আঘাত পাব না। কারণ এটি ক্ষয়িষ্ণু দুনিয়া, শাশ্বত জান্নাত নয়।

এজন্যই প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে এবং আমাদের প্রথম পর্যায়ের চিকিৎসা হিসেবে দরকার এই আবেগময় পথের কুশলী শল্যকরণ। এবং এটা শেখা যে, কীভাবে হৃদয় ভাঙার পরও ফিরে আসতে হয়—কীভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে হয়; এজন্য আমি মনে করি যে, এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যেটি বাদ রয়ে গেছে।

শুরু করার আগে, এই বইটি থেকে আমরা কী অর্জন করব, তার একটি অভিপ্রায় নির্ধারণ করা হোক। মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলা আমাদের বলেন যে—তারা যা চেষ্টা করে তা ব্যতীত মানবজাতি কিছু পায় না। এজন্য আমাদের জানতে হবে, আমরা কীসের জন্য চেষ্টা করছি, যদি আমরা তা অর্জন করতে চাই। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইচ্ছের কারণেই যা কিছু ঘটার, ঘটে এবং ব্যক্তি যা ইচ্ছে করে, তা-ই পেয়ে থাকে।

নিজের সঙ্গে যুদ্ধ

আপনি যখনই আহত হন অথবা কোনো কিছুর দ্বারা আঘাত পান, মনে করুন শারীরিক আঘাত—কী করেন তখন আপনি? প্রথমেই খুঁজতে থাকেন সেই আঘাতের চিকিৎসা করার যেকোনো একটি উপায়। আপনি জানেন যে, এই আঘাত সারিয়ে তোলার এবং সুস্থ হওয়ার কোনো না কোনো উপায় কোথাও না কোথাও অবশ্যই আছে।

শারীরিক ক্ষতের নিরাময়ের জন্য আমরা কি কিছু করতে পারি? উত্তর হলো, হ্যাঁ। আমরা এটাকে পরিষ্কার করতে পারি, এর যত্ন নিতে পারি, ডাক্তারের কাছে যেতে পারি। যদি কেউ বন্দুকের গুলি দ্বারা আহত হয়, তাহলে সেই ক্ষত নিরাময়ের জন্য অবশ্যই কিছু উপায় আছে। আবার সেই ক্ষত নিরাময়ে যদি দেরি হয়, তাহলে তার পেছনেও কিছু কারণ থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কেউ আঘাত পেল, কিন্তু সে এটা পরিষ্কার করল না, শুধু একটা ব্যান্ডেজ দিয়ে জড়িয়ে রাখল, তাহলে সেই ক্ষতের কী হবে? এটি তখন সংক্রমিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। এবং এটা কোনো ব্যাপার নয় যে, আপনি এটাকে জড়িয়ে রেখেছেন। আপনি এটা বলতে পারেন, 'আহ, আমি বন্দুকের গুলিতে আঘাত পেয়েছি। আমি ব্যান্ডেজ দিয়ে এটাকে জড়িয়ে রেখেছি, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' আসলে, এভাবে এটা ঠিক হবে না, সেরে উঠবে না—যতই আপনি এটাকে জড়িয়ে রাখুন না কেন।

অনেকে বলে, সময়ের সঙ্গে ক্ষতগুলো সেরে উঠবে। সময়ের ব্যবধানে এই ক্ষত কীভাবে সেরে উঠবে, যেখানে এটাকে পরিষ্কার করা হয়নি, চিকিৎসা করা হয়নি, যত্ন নেওয়া হয়নি শুধু পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে? এটার অবস্থা তো আরও খারাপ হবে। শুধু ব্যান্ডেজ ওটাকে সারিয়ে তুলতে পারবে না। সময়ের সঙ্গে ক্ষত সেরে উঠবে, এটা আসলে একটা ভুল ধারণা। কারণ, আপনি যদি এর সঠিক যত্ন না নেন, এমন কিছু করেন, যাতে করে এই ক্ষত আরও খারাপের দিকে চলে যেতে থাকে, তাহলে সময়

গড়ালেও এটা সেরে তো উঠবেই না, বরং আরও দগ্ধ, আরও ঝাঁজরা হতে থাকবে সেটা। আপনি প্রতিদিন এই ক্ষত বয়ে বেড়াবেন এবং এতে ময়লা লাগাবেন, অথবা যতবারই এর ছিলা উঠতে থাকবে, আপনি চামড়া উঠাবেন, জীবাণুগুলোকে প্রশ্রয় দেবেন, তাহলে সময়ের সঙ্গে এটা কখনোই সেরে উঠবে না। দিনকে দিন এর আরও খারাপ পরিণতি ঘটতে থাকবে।

সুতরাং কিছু উপায় আছে, যাতে করে আমরা ক্ষত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারি অথবা এর আরও খারাপ অবস্থা করতে পারি, যাতে করে ব্যথা আরও বেড়ে যায়। ঠিক এখান থেকেই আমাদের শেখা শুরু করতে হবে। সাইকোলজিস্টরা এটা বের করেছেন যে, মানুষ এমন কিছু অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত, যার কারণে তার সুস্থ হয়ে উঠতে দেরি হয়। এটা অনেকটা নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করার মতো। কিন্তু আমরা জানি না যে, আমরা সেটা করছি। অথচ আমরা উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে এটা করছি না।

কেউ এটা বুঝতে পারে না যে, সে মূলত ক্ষতের ওপর ময়লা লাগাচ্ছে, চামড়া উঠাচ্ছে, জীবাণুগুলোকে পেলেপুষে আরও বড় করছে এবং মনে করছে যে, সময় অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত সেরে উঠবে; কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সময়ে তা আর সেরে ওঠে না?

আমরা কী করি

আমরা এমন কী করি, যার দরুন আমাদের সুস্থ হতে দেরি হয়?

মনস্তাত্ত্বিকগণ একটি জিনিস বের করেছেন, যা ব্যাধি বা খারাপ অভ্যাসগুলো সেরে ওঠার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী পদ্ধতি—তা হলো সামাজিক সমর্থন। এ এমন একটি জিনিস, যা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। এই সমর্থন হতে পারে আপনার থেরাপিস্ট অথবা বন্ধুমহল কিংবা পরিবার। এমনকি আপনার বন্ধু এবং পরিবার—উভয় পক্ষ থেকেই এর অনুকূল সমর্থন দরকার হতে পারে। যখন এই সামাজিক সমর্থন আপনার পক্ষে থাকে না, তখন তা আপনাকে আরও আঘাত দিতে পারে অথবা সেরে উঠতে দেরি হতে পারে।

আমরা বিশ্বাসী হিসেবে কী করতে পারি, সেরকম সমস্যায় যদি আমরা কখনো পড়ি? আমাদের প্রথম কাজ হবে আল্লাহর প্রতি রুজু হওয়া। এখানে চমৎকার একটি জিনিস আমাদের হাতে আছে, সেটি হলো—কেউ যখন আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, আল্লাহও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না, আল্লাহর সঙ্গে এমন গুরুত্বপূর্ণ এক বন্ধনের কারণে আমরা সেই সমর্থন পাওয়ার জন্য তাঁর প্রতি রুজু হই। এটি এমন না যে, আমরা একজন আরেকজনকে সমর্থন করব না। এটি এমনও না যে, আমাদের একজন আরেকজনের কাছ থেকে উপকার বা সমর্থন পাওয়ার দরকার নেই। এর মানে হলো আমাদের সঙ্গে আল্লাহ আছেন, তিনি সর্বদা আমাদের সহায়তার জন্য প্রস্তুত আছেন।

আল্লাহর প্রতি রুজু

এটি মানসিক আঘাত থেকে সেরে ওঠার জন্য সবচেয়ে অপরিহার্য উপাদান। কার্যত এর অর্থ হলো বেশি বেশি দুআ করা, বেশি বেশি সিজদা করা এবং চোখের পানি ফেলা। কথায় আছে, আমাদের ভুলে যেতে হবে চোখের পানি হলো দুর্বলতার লক্ষণ; কান্না

করা মানে আপনি দুর্বল এবং কান্না না করা মানে আপনি শক্তিশালী। এটা ভুল কথা। এটা সর্বৈব মিথ্যে, ইসলামের দিক থেকে এটা আরও প্রমাদ, আপনি যদি মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার দিক থেকেও দেখেন, সেখানেও এটা অসার ও অলীক সাব্যস্ত হবে।

মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার ফলে কেউ যখন তার আবেগকে দমন করে, তখন এটা তার আবেগকে দূরে সরিয়ে দেয় না; বরং আরও বাড়িয়ে দেয়। তারা বলে, যেকোনো আবেগকে দমন করার চেষ্টা করা বা এড়িয়ে চলা আবেগকে আরও চূড়ান্ত করে তোলে। আপনি এটাকে আরও বড় এবং আরও সুস্পষ্ট করে তুলছেন।

কান্না এবং আবেগ হলো দুর্বলতা, এই ধারণাটাই মূলত দুর্বল একটা ধারণা। যখন নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদছিলেন, তখন তাঁর এক সাহাবি তাঁকে বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হয়েছে রাসুলুল্লাহ?'

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'চোখের পানি আল্লাহর একটা করুণা, যেটা তিনি মুমিনদের অন্তরে দিয়েছেন।' এভাবেই চোখের পানিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূল্যায়ন করেছেন। এটা কোনো দুর্বলতা নয়। এটা আল্লাহর সৃষ্টির কোনো ভুলও নয়। সেজন্য নিরাময়ের এই প্রাকৃতিক আচরণটিকে অস্বীকার করা রীতিমতো স্বভাববিরুদ্ধ একটা কাজ। আপনি যদি একে অস্বীকার করেন, তাহলে সব সময় দেখবেন যে, আপনি সুস্থতাকে কোনো স্থির বিন্দুতে থামিয়ে রাখছেন। আপনি আপনার নিরাময়ের পথ পাচ্ছেন না। কারণ এটা আল্লাহর এক ঐশ্বরিক নকশা। আপনার কাজ হবে এই নকশাকে আরও পরিশ্রুত করা। তিনি আমাদেরকে চোখের পানি এবং কান্নাকে করুণা ও রহমত হিসেবে দিয়েছেন, যেটা আমাদের নির্মল করে, আত্মাকে শুচিশুভ্র করে। এটা নিরাময় প্রক্রিয়ার এক অনিন্দ্য সুন্দরাংশ।

আমরা এটা কীভাবে জানব? এই পৃথিবীর বুকে আসা সেরা মানুষের জীবনী লক্ষ করুন, তারা কারা? নবিগণ (তাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তারা কান্না করেছেন, তারা দার্শনিক ছিলেন না, তারা কঠিন মনের অধিকারী ছিলেন না। ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম কান্না করতে করতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখের বছর কাটিয়েছেন, যখন তিনি তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর চাচাকে হারিয়ে ছিলেন। তাঁদের আবেগ ছিল এবং তাঁরা তাঁদের আবেগকে প্রকাশ করেছেন। এর মানে এ নয় যে, তাদের ধৈর্য ছিল না বা তাঁরা অসংযমী ছিলেন।

আপনি যদি কুরআনে বর্ণিত সেই ব্যক্তির উদাহরণটি দেখেন, যার সুন্দর ধৈর্য ছিল, যিনি কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং আপনি দেখছেন অসীম ধৈর্য এবং চোখের পানি অসংগত কিছু নয়। এটা সুস্পষ্ট।

সবর এমন একটা জিনিস, যেটা বাহ্যিকভাবে ঘটে না। এটা অন্তরে থাকে। যখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শোকের মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি এই সুন্দর এবং বিখ্যাত উক্তিটি করেন, 'চোখ অশ্রুসঞ্জন করে এবং হৃদয় দুঃখ অনুভব করে, তবে জিহ্বা আল্লাহর পক্ষে যা সন্তোষজনক তা উচ্চারণ করতে বাদ সাধে না।' এটাই হলো ধৈর্য। তিনি শোক অনুভব করেছেন এবং কেঁদেছেন, কিন্তু আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেননি। এটি মেনে নেওয়ার স্বভাব নয়, এটি কেবল মানুষ হিসেবে যা হারিয়েছে তার জন্য শোক অনুভব করা।

হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন একজন সাহাবি, যাকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর ডাকনাম ছিল 'আল বাক্কা', যার মানে হলো, যে অনেক কান্নাকাটি করে। বিখ্যাত এক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর মৃত্যু শয্যায় ছিলেন, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন, 'তোমার বাবাকে সালাতের নেতৃত্ব দিতে বলো'। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কী জবাব ছিল? 'কিন্তু বাবা অনেক কাঁদছেন।' নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবাব ছিল, 'তোমার বাবাকে সালাতের নেতৃত্ব দিতে বলো।'

এমনই এক মর্যাদাপূর্ণ মানুষ, হজরত উমর রাদিয়াল্লা আনহু। তাঁর মুখে অশ্রুর দাগ পড়ে গিয়েছিল। পৌরষবোধ এবং কান্নাকাটি, অথবা সবর এবং কান্নার মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা তফাত নেই।

এজন্য প্রথমেই আমাদের যে কাজটা করতে হবে, সেটা হলো: এই বস্তাপচা ধারণা ভেঙে দিতে হবে যে, কান্না মানে তোমার কোনো ধৈর্য নেই। লোকেরা আপনাকে শেখায় এবং বলে, 'আপনার আবেগকে দমন করুন, যাতে আপনি সবর করতে পারেন।' এই কথাটিই বিপজ্জনক কথা।

আপনি যদি এ জাতীয় কথা বলেন, তবে সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা ঘটবে, তা হলো: তার আবেগ বিষাক্ত হয়ে উঠবে। এটা সত্যিকারের ক্ষতিকারক কিছুতে পরিণত হবে, যা হলো ক্রোধ। বিশেষ করে আল্লাহর বিরুদ্ধে রাগ। চিন্তা করে দেখুন। আবেগ এমন একটি জিনিস, যা আপনাকে মোকাবিলা করতে হবে। আপনি যদি তা মোকাবিলা না করেন, তবে এটি কিন্তু অদৃশ্য হয়ে যায় না, এতে পচন ধরে। এটি বিষাক্ত হয়ে ওঠে। আমি বিষাক্ত শব্দটি এখানে রূপক অর্থে ব্যবহার করিনি। অমীমাংসিত আবেগ প্রকৃতপক্ষে শারীরিকভাবে আপনার স্বাস্থ্যকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। এটা ক্যান্সারে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে। এটা খুবই বিষাক্ত এক চিজ।

আপনার যখন আবেগ থাকে, তাকে নিয়ে অশ্রুসিক্ত হোন। আর আপনি এটিকে দমন করার চেষ্টা করছেন বা এড়াতে চাইছেন; বন্দুকের ক্ষতের মতো যেটি আপনি কেবল

একটি ব্যান্ডেজের সাহায্যে জড়িয়ে রাখেন, এটি তখন আরও সংক্রমিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। অমীমাংসিত আবেগ এমনই কাণ্ড ঘটিয়ে থাকে।

এটি শোক হিসেবে শুরু হতে পারে। তবে এর কারণ মূলত সমস্যাটার সমাধানই কখনো হয়নি অথবা এটি চাপা পড়ে গিয়েছিল কিংবা আপনার আশেপাশের মানুষজন এটিকে খুঁচিয়ে আরও ঘা বানিয়েছে। এরা বলতে থাকে, 'ধৈর্য ধরো', 'ভুলে যাও', 'কান্না বন্ধ করো', 'শোক করো না'। আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে, আপনি ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়েও শক্তিশালী। কুরআনে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি ধৈর্যের প্রতীক।

যখন এটা অমীমাংসিত এবং আপনার আশপাশের লোকজনদের দ্বারা আপনি প্রভাবিত হন, তখন আপনার মনে হতে থাকে যে, আপনি শোক প্রকাশ করবেন না। কারণ আপনার আশপাশের মানুষজন এটা গ্রহণ করছে না, অথবা তারা মনে করবে, আপনি দুর্বল। আপনি চান সবাই আপনাকে শক্তিশালী মনে করুক। তাই না? এজন্য আপনাকে প্রকাশ করার মতো আপনার সেই সামর্থ্য নেই, অথবা আপনি নিজেই নিজের অনুভূতি বিচার করছেন। আমাদের অনুভূতি আমাদের কাছে।

আমরা ভারি বিচারক বটে। আমরা অন্যদের বিচার করি এবং আমাদের নিজেদেরও বিচার করি।

আপনার আবেগ আছে; এই আবেগ সম্পর্কে আপনার একটি পরিচ্ছন্ন বোধ থাকতে হবে। ঠিক? আপনি দুঃখ পেয়েছেন, এজন্য আপনি ক্ষিপ্ত যে, আপনি দুঃখিত। আমরা ভীষণ ভারি বিচারক বটে। আমরা কোনো কিছু অনুভব করতে পারি না। এটা অস্বাস্থ্যকর এবং এর মানে হলো, আপনার নিজের প্রতি মমত্ববোধ নেই। আপনার যদি আবেগ থাকে, তবে এটাই স্বাভাবিক যে, আপনি সেটা অনুভব করবেন। এটা খুব দ্রুত সমাধান করা উচিত, যদি আপনার অনুভূতি সম্পর্কে কোনো বদ্ধধারণা না থাকে।

কোনো আবেগের মধ্য দিয়ে যাওয়ার দ্রুততম উপায় হলো—সেটি অনুভব করা। কিন্তু আমরা সেটা করি না। আমরা বুঝতে পারি না, এটা হচ্ছে নিজের প্রতি নাশকতা। আমরা এটা দীর্ঘ সময়ব্যাপী বয়ে বেড়াই এবং জিনিসটাকে আরও মাত্রাহীনভাবে খারাপ করে তুলি। আপনার আবেগ আছে; এটাকে অনুভব করার পরিবর্তে আপনি এর বিচার করেন। আপনি নিজেকে আঘাত করেন, কষ্ট দেন, একে দমন করেন। আপনি এখন যা করছেন, তা কেবল একটা বিরতি। শুধু তা-ই নয়, আপনি এটিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। এটি অতীত হতে পারত, যদি আপনি কেবল এটি অনুভব করতেন এবং এটি থেকে বের হয়ে আসতে পারতেন।

সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি দুঃখ বা ক্ষতির মুখোমুখি হয়, তখন তাকে এটি সমাধান করার সম্মতি দেওয়া হয় না বা এর সমাধানের জন্য অনুমতি দেওয়া হয় না। তখন যা ঘটে, তা হলো দুঃখ ক্রোধে পরিণত হয়।

আপনি আপনার বেদনাকে নিজ থেকেই সমাধান করার অনুমতি দেননি এবং আপনি এটিকে কোনো মুক্তিও দেননি। সুতরাং এটি এমন এক খাবারের মতো, যা আপনি সপ্তাহ-মাস ধরে রান্নাঘরের কাউন্টারের বাইরে রেখে যান; তখন এর কী হয়? যা একটি সুস্বাদু পনির কেক হিসেবে ব্যবহৃত হতো, তা এখন বিষাক্ত ছাঁচে আবৃত। প্রকৃতপক্ষে মানুষের আবেগগুলো অভ্যন্তরীণ কলকব্জায় এমন কাণ্ডটিই ঘটায়। তাদের অনুভূতি বিষাক্ত হয়ে উঠে। দুঃখটি বিষাক্ত ছিল না; এটি শুধু সমাধান করার দরকার ছিল, আপনার এটি অনুভব করা দরকার ছিল, এটি থেকে বের হয়ে আসার প্রয়োজন ছিল। এটি থেকে বের হয়ে আসার জন্য আপনার চিকিৎসা দরকার ছিল। এজন্য আপনাকে আল্লাহর প্রতি সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এভাবেই এটিকে সমাধান করা যাবে, পরিষ্কার করা যাবে এবং এ থেকে বের হয়ে আসা যাবে।

কিন্তু যখন আপনি এটি করছেন না, এটি বিষাক্ত হয়ে ওঠে। এখন এটি ক্রোধ এবং ক্ষোভে পরিণত হতে পারে। অভ্যন্তরীণভাবে আপনি কঠোর হয়ে উঠছেন। এই রাগ আল্লাহর প্রতিও এসে পড়ে। 'আমি আল্লাহর ওপর রেগে আছি কারণ তিনি কীভাবে আমার সাথে এটি করতে পারেন?' আপনি বুঝতে পেরেছেন এটা কেন ঘটে এবং কেন এটা বিপজ্জনক এবং সবচেয়ে বিষাক্ত বিষয়ে পরিণত হতে পারে। বন্দুকের গুলির ক্ষত যা আপনি কখনোই বুঝতে পারেননি এবং আপনি এটিকে ঢেকে রেখেছেন এতদিন, যার ফলে এটি আরও সংক্রমিত হয়ে পড়েছে।

আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন। এটিকে অনুভব করুন, শোক করুন। মানুষ হওয়া নিয়ে লজ্জার কিছু নেই। কারণ আল্লাহ তিনিই, যিনি আপনাকে মানুষ হিসেবে তৈরি করেছেন। তিনি ভুল করেন না। সুতরাং মানুষ হোন এবং আল্লাহ যেই নকশাটি করেছেন সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করুন। আল্লাহ বলেন, অশ্রু এমন একটি রহমত, যা তিনি মুমিনদের অন্তরে রাখেন। সেই দয়াটি গ্রহণ করুন, ব্যবহার করুন এবং নিরাময়ের প্রক্রিয়াটি অবলম্বন করুন।

দুআ এবং সিজদায় চোখের পানির মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন। বিশেষ করে তাহাজ্জুদের সময়—এটি সবচেয়ে নিরাময়কারী জিনিস, যেটা আপনি করতে পারেন। হাদিসে আছে যে, এই সময়ে আল্লাহ সাত আসমানের নিচে নেমে আসেন এবং বান্দাকে ডাকেন, 'কে আমাকে ডাকছে যাতে আমি তাকে দিতে পারি, তাকে সহায়তা করতে পারি। কে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে'। এসময় আল্লাহ বান্দাকে সন্ধান করেন। এজন্যই এটি সবচেয়ে নিরাময়কারী সময়। আপনার জরুরি মতবিনিময় প্রহর।

আপনি আল্লাহ সুবাহানাহু তাআলাকে ডাকুন, তাঁর কাছে সাহায্যের জন্য কান্নাকাটি করুন। আপনাকে শক্তিশালী হওয়ার ভান করার দরকার নেই। আপনি যেমন সেভাবেই আল্লাহর সামনে নিজেকে মেলে ধরুন। আল্লাহর কাছে ভেঙে পড়ুন এবং কাঁদুন। আমি আপনাকে প্রতিজ্ঞা করছি যে, এটাই আপনার সবচেয়ে দ্রুততম নিরাময়ের উপায়।

আপনি যখন নবিদের দুআগুলো লক্ষ করবেন, সেগুলো ভীষণ শক্তিশালী। উদাহরণস্বরূপ, হজরত আইয়ুব আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ, আমি এই দুআকে ভীষণ পছন্দ করি। কারণ, তিনি পরীক্ষার মধ্যে ছিলেন। একটির পর একটি পরীক্ষা তার ওপর আসছিল। তিনি তার স্বাস্থ্য হারিয়েছিলেন, ধন-সম্পদ হারিয়ে ছিলেন, পরিবার হারিয়েছিলেন। বছরের পর বছর তিনি এ অবস্থায় ছিলেন। বছরের পর বছর কষ্ট সহ্য করার পর তিনি আল্লাহকে এই বলে ডাকতে থাকেন; 'দুর্ভোগ আমার ওপর পড়েছে, আর আপনি তো পরম করুণাময়।'

নুহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৯৫০ বছর সংগ্রাম করার পর অবশেষে আল্লাহকে ডাকেন, 'আমি পরাস্ত হয়েছি, আমাকে বিজয় দান করুন।'

তারা সবাই এভাবেই আল্লাহকে ডেকেছেন। তারা কখনো ভান করেননি এবং এটা মনে করেননি যে, 'আমি ভালোই আছি, আমি কষ্ট কাটিয়ে উঠব'। তারা কখনোই এমন করেননি।

'আমার আত্মবিশ্বাস আছে', অথবা 'আমি শক্তিশালী'। না, আপনি প্রকৃতপক্ষে তা নন। আপনি সাধারণ একজন মানুষ এবং আল্লাহকে আপনার দরকার। আপনি যদি নিজের শক্তির এর ওপর নির্ভর করেন, তবে তার জন্য শুভকামনা। আমরা কেউই নবিদের থেকে শক্তিশালী নই। তারা কখনোই তাদের শক্তির ওপর অথবা নিজেদের ওপর নির্ভর করতেন না।

তারা যখনই কোনো কষ্টকর অবস্থার মধ্যে পড়তেন, তখনই আল্লাহর ওপর ভরসা করতেন। সুতরাং ভুল করে হলেও আমাদের এমন কোনো চিন্তা করা যে, আমরা নিজেদের ওপর নির্ভর করতে পারি—তা বেশ ভয়ংকর এবং মর্মান্তিক বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে আমাদের জীবনে।

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, 'চোখের পলকের জন্যও আমাকে ছেড়ে যাবেন না।' চোখের পলক ফেলতে কত সময় লাগে? খুব একটা বেশি সময় লাগে না। আর তিনি বলছেন, এমনকি চোখের পলক ফেলতে কত সময় লাগে ঠিক তত সময়ের জন্য হলেও তাঁকে ছেড়ে যেন না যায়। তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি আল্লাহর প্রিয়তম, এবং তিনি নিজের ওপর নির্ভর করতেন না।

সুতরাং এটা করার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন, যখন আপনি মনে করেন—'সমস্যা নেই', 'আমি শক্তিশালী', 'আমার বিশ্বাস অনেক মজবুত'। কিন্তু না, প্রতিটি মানুষেরই আল্লাহকে প্রয়োজন। যদি আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষদের দিকে লক্ষ করি, তবে তাদের আল্লাহর প্রয়োজন ছিল এবং তারা তা স্বীকার করেছেন।

ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সবচেয়ে অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে ছিলেন—তিনি ছিলেন তিমির পেটে, সমুদ্রের পেটে, রাতে—কল্পনা করুন সেই মানুষটির ওপর অন্ধকারের কতগুলো স্তর ছিল। অন্ধকারের মাত্র একটা স্তর ছিল না। স্তরের ওপর স্তর অন্ধকার ছিল তার ওপর।

তিনি ফাঁদে পড়েছিলেন। এখন দেখার বিষয় তিনি আল্লাহ তাআলাকে কীভাবে ডেকেছিলেন। *লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জোয়ালিমিন।* আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, আল্লাহ সবার ওপরে, সবকিছুর ওপর মহিমান্বিত, নিশ্চয় আমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

তারা নিজেরা বিনীত হয়ে আল্লাহকে ডেকেছিল, তারা কখনোই নিজেদের ওপর নির্ভর করেনি। এভাবেই তারা রক্ষা পেয়েছিল। তাদের প্রত্যেককেই রক্ষা করা হয়েছিল। আল্লাহ কাউকেই সেই অবস্থার মধ্যে ফেলে রাখেননি। তারা সেই অবস্থার মধ্যে পড়ে থাকেনি। আল্লাহ সবার জন্য রাস্তা খুলে দিয়েছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন।

আল্লাহ ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করেছিলেন, আইয়ুব আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যা তাঁর হারিয়ে গিয়েছিল, বরং আরও বেশিই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহ নুহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক অনুসারীদের রক্ষা করেছিলেন, কারণ তারা আল্লাহকে ডেকেছিলেন—নিজেদের ওপর নির্ভর করেনি—বিনীত হয়ে আল্লাহর সাহায্য চেয়েছিলেন।

এমনকি আপনি যদি আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে লক্ষ করেন, যখন তিনি নিষিদ্ধ ফল খেয়ে ছিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলাকে বলেন, 'আমরা নিজেদের ওপর অন্যায় করেছি। আর আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন এবং আমাদের প্রতি দয়া না করেন তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে পড়ে যাব।' তিনি আল্লাহর ওপর নির্ভর করেন এবং আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন।

এজন্য আবারও যে কথাটি বলতে চাই, তা হলো: আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন, আল্লাহর কাছে চান এবং তাঁর কাছে সৎ থাকুন।

যেকোনো কষ্টকর পরিস্থিতিতে আল্লাহকে বলুন, 'এটি কষ্টদায়ক। এটি কঠিন। আমাকে সাহায্য করুন। আমাকে সুস্থ করুন। এটি আমার জন্য সহজ করুন।' আল্লাহর কাছে

চান। ইস্পাতমানব হওয়ার চেষ্টা বন্ধ করুন। 'আমি শক্তিশালী, এটি আমার কিছুই করতে পারবে না, আমি ভালোই থাকব।' এগুলো সম্পূর্ণ মরীচিকা চিন্তাভাবনা।

মূলত যদি কেউ আল্লাহর কাছে ফিরে না আসে এবং আল্লাহর সাহায্য না চায়, তাহলে তার সেরে উঠতে দেরি হবেই, তার সুস্থ হওয়াকে থামিয়ে দেবেই।

আত্ম কিংবা মমত্ববোধের অভাব

ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে, যেখানে আমরা নিজেরাই নিজেদেরকে কষ্ট দিই। যেমনটা আমি বলেছিলাম আগে, আপনি শোক পালন করছেন, তার পর নিজেকে কষ্ট দেওয়া শুরু করছেন।

এটি কেবল অন্যরাই নয়, আমরা নিজেরাই করি। হয়তো আপনি কিছু পাননি এবং সেজন্য আপনি হতাশ। আপনি সত্যিই নিজের জন্য মমতা বোধ করছেন না। আপনি নিজের ওপর খুব কঠিন হচ্ছেন। কারণ আপনি খুব ভারাক্রান্ত। আপনি মনে করেন, আমরা যা ভাবছি তা গ্রহণযোগ্য নয়।

নিজের প্রতি মমত্ববোধের অভাব আপনার সুস্থ হবার পথে অন্তরায় এবং আপনাকে হতাশায় ফেলে দেয়। আপনি প্রকৃতপক্ষে নিরাময় প্রক্রিয়াটি নিজের প্রতি মমত্ববোধ এবং সহানুভূতি তৈরির অভাবে আরও দীর্ঘতর করে তুলছেন।

আপনার আশপাশের লোকেরা বেশিরভাগ সময়ই আগুনে ঘি ঢেলে দেয়, তারা আপনাকে বলে, 'যথেষ্ট হয়েছে, শোক পালন বন্ধ করুন। ছাড়ুন এবার—এমনকি আপনি নিজেও নিজের সঙ্গে এটি করেন।

সুতরাং নিজের প্রতি মমত্ববোধ খুবই জরুরি। আপনার অনুভূতি সম্পর্কে নেতিবাচক অনুভূতি রাখা বন্ধ করুন।

নেতিবাচক চেতনা

নেতিবাচক চেতনা ও কিছু খামখেয়ালি আচরণ নিরাময় প্রক্রিয়াটিকে দীর্ঘায়ত করার তৃতীয় বিষয়। এককথায় নিজের ওপর বিরূপ ধারণা পোষণ করা।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ আপনাকে ছেড়ে চলে গেল, আপনার সাথে ছাড়াছাড়ি করে ফেলল, আপনাকে তালাক দিলো। নেতিবাচক চেতনা হলো, 'সবাই চলে গেছে কারণ আমি ভালোবাসার যোগ্য নই'। অথবা 'আমি অনেক মোটা'। অথবা 'আমি খুব একটা সুন্দর না'। অথবা 'আমি যোগ্য নই'। এগুলোই হলো আপনার নিজের প্রতি করা

নেতিবাচক চেতনা। আপনি নিজের প্রতি খুবই নীচু ধারণা পোষণ করেন। এটাও নিরাময় প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়ত করে।

নিজের প্রতি অতিরিক্ত অনুসন্ধান

কিছু একটা ঘটেছে, অথবা কোনো কিছু কাজ করছে না, অথবা আপনি যেটা ভালোবাসেন তা হারিয়েছেন, আর আপনি নিজের ওপর দোষ চাপিয়ে দিতে শুরু করলেন।

'এটা আমার ভুল', 'আমি নিশ্চয় কিছু করেছি যার জন্য এটা হয়েছে', এই জিনিসটাও মনের নিরাময় দীর্ঘায়িত করে। অতিরিক্তভাবে নিজেকে দোষ দেওয়া বা নিজেই অভ্যন্তরীণভাবে এই দোষ মেনে নেওয়া একটা গভীর মানসিক-ব্যাধি, যার চিকিৎসা আগে দরকার।

গ্রহণযোগ্যতার অভাব

জীবনে কোনো একটা খারাপ ঘটনা ঘটতেই পারে, আপনি তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না, এটি হলো গ্রহণযোগ্যতার অভাব। আর এই ব্যাপারটি মনের নিরাময়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

একটা ভাঙা হৃদয়কে কীভাবে ঠিক করা যায়, শিরোনামের একটি বইয়ে, লেখক যিনি একজন মনোবিজ্ঞানী তিনি তার ২০ বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পেশেন্টদের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন। তার একজন পেশেন্ট ছিলেন, যিনি একটি বিশেষ ঘটনায় সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছিলেন। ঘটনাটি এরকম: তিনি একটি সম্পর্কে জড়িয়ে ছিলেন এবং তিনি লোকটির সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রত্যাশা করেছিলেন কিন্তু প্রস্তাব গ্রহণের পরিবর্তে লোকটি তার সঙ্গে সম্পর্কই ছিন্ন করে বসে। মনোবিজ্ঞানী কীভাবে তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে কথা বলেছেন এবং তিনি বলেছিলেন যে, একটি বিষয়ের কথা বিশেষভাবে বলেছেন, যা তার নিরাময়কে এতটা বিলম্বিত করেছিল, আর তা হলো, তিনি লোকটির সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কারণটি মেনে নিতে পারেনি । সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কারণ হিসেবে লোকটি যা দেখিয়েছিল, সেটা মেনে না নিয়ে তিনি অন্য কারণ খোঁজার পেছনে সময় ব্যয় করেছেন। তিনি পরবর্তী বারো মাস ধরে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার আসল কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেই যান।

লোকটি সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার যে কারণ দেখিয়ে ছিল সেটা এককথায়—

তোমার প্রতি আগ্রহ গড়ে ওঠেনি।

এই কারণটি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে তিনি অন্য কিছু চিন্তা করতে থাকেন। মনে করতে থাকেন, 'না... না, নিশ্চয় অন্য কোনো কারণ আছে। তিনি কারণটা খুঁজে বের করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভাবতে থাকেন, তাদের একসঙ্গে থাকা শেষ সপ্তাহান্তের কথা, তিনি কী ভুল করেছেন সেটা ভাবতে থাকেন। তিনি কি এমন কিছু বলেছিলেন, যেটা তার কাছে খারাপ লেগেছিল, অথবা 'আমি হয়তো তার চাহিদা এবং অন্য কোনো কিছু পূরণ করার জন্য যথেষ্ট ছিলাম না।'

এখন তিনি যেটা করছেন, সেটা হলো তিনি তার নিরাময়কে বিলম্বিত করছেন। কারণ, তিনি এই সম্পর্ক ভেঙে যাওয়াটাকে মেনে নিতে পারছেন না। যখন কোনো গোয়েন্দা একটি কেস শেষ করেন, তখন ফাইলটি বন্ধ করে দেন। কিন্তু এই পেশেন্ট সেটা করেননি। এটা তখনও খোলাই ছিল। যেন একটা প্রকাশ্য ক্ষত এবং সে নিজেই এটি উদোম করে রেখেছে।

মনোবিজ্ঞানীটির মতে, পেশেন্টটি কারণ খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। লোকটির তার প্রতি কোনো অনুভূতি নেই—এটা মেনে নেওয়ার পরিবর্তে তার নিজের কী ভুল ছিল, সেটা বের করতেই তিনি সময়গুলো নষ্ট করছিলেন।

সুতরাং মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যেটা আপনাকে দ্রুত নিরাময়ে সাহায্য করবে। যখন কারও এই জিনিসটা না থাকে, তখন অবস্থা থেকে বের হয়ে আসার পরিবর্তে তাদের নিরাময়ের প্রক্রিয়াটি দীর্ঘায়িত করতে থাকে।

বিশ্বাস হিসেবে আপনি যখন এটা শুনেন অথবা পড়েন, তখন বুঝতে পারবেন যে আমাদের দ্বীনের মধ্যে একটি সরঞ্জাম রয়েছে। আমাদের এই সমস্যাটিতে সাহায্য করার জন্য একটি আধ্যাত্মিক উপকরণ রয়েছে। তা হলো কদ আরাদাল্লাহু ওয়া মা শা আ ফা'লা। আল্লাহ ইচ্ছা করেন এবং যা ইচ্ছা তা করেন। আমাদের বিশ্বাস আছে এবং আমাদের আকিদার একটি অংশ হলো, কিছু জিনিসের ব্যাখ্যা আমাদের কাছে অস্পষ্ট রাখা হয়। এবং এটি গ্রহণ করা আপনাকে দ্রুত নিরাময়ে সহায়তা করবে। যেটা হয়নি, সেটা হওয়ার ছিল না। এবং এটি আমার জন্য ভালো ছিল না।

আমাদের সেই আধ্যাত্মিক জোগাড়যন্ত্র রয়েছে, কারণ আমরা জানি, আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে জ্ঞানী। তিনি ভবিষ্যৎ জানেন। আল্লাহ জানেন যা আমরা জানি না; এবং আমরা মাঝেমধ্যে এমন কিছু জিনিস চাই, যেটা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক নয়।

বিশ্বাসী হিসেবে আমরা এটা বেশ ভালোভাবেই জানি কিন্তু সমস্যাটি হয় মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে। আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনে বলেন,মাঝেমধ্যে আমরা যা-কিছু ঘৃণা করি, সেটা আমাদের জন্য মঙ্গলজনক, এবং যা-কিছু ভালোবাসি সেটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। আল্লাহ জানেন, যা আমরা জানি না।

এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রাথমিক চিকিৎসা। আমাদের নিরাময়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম। আমরা সত্যকে চিনে নেব। আমাদের বুঝতে হবে যে, আল্লাহ জানেন যা আমরা জানি না। এটা হতে পারে যে, আমরা এমন কিছু চাই, যেটা আমাদের জন্য ভালো না। যত দ্রুত আপনি বাস্তবতা বুঝতে পারবেন, তত দ্রুত আপনি সেরে উঠবেন। যারা এই বাস্তবতাকে প্রত্যাখ্যান করে, মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাদের জীবনে নিরাময় থমকে যায়।

ক্ষতিকর কারণটিকেই আদর্শ করে তোলা

এটার মানে কী? যা-কিছু খারাপ ঘটেছে, অথবা পরিস্থিতি এসেছে সবকিছু ভুলে শুধু ভালোটাই মনে রাখা।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ আপনার হৃদয় ভেঙে দিয়েছে। এবং সে সত্যিই ভয়াবহ ছিল, কিন্তু কীভাবে যেন সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কিছু সময় পরেই তাদের সমস্ত জঘন্য বৈশিষ্ট্য অদৃশ্য হয়ে যায়। আপনি যা মনে রাখবেন তা হলো ভালো জিনিস।

প্রথমত এটা হলো একটা প্রতারণা। আপনার মন আপনাকে এমন কৌশলের মধ্যে চালিত করে, যেটা আপনার নিরাময়ে বিলম্বিত করে। শুধু ভক্তি করাই নয়, আদর্শিককরণ—হঠাৎ করেই সেই বস্তুকে আদর্শ বা নিখুঁত দেখায়।

সেই মনোবিজ্ঞানীটি বলছিলেন, তিনি তার পেশেন্টকে বলেছিলেন, যে লোকটি তার হৃদয় ভেঙেছে তার সমস্ত খারাপ গুণগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে নিজের কাছে রাখতে। অবমাননাকর বিবাহের মধ্যে ছিলেন এমন একজন, যিনি এই বিবাহ থেকে বের হয়ে আসার পর একজন ভালো মানুষকে বিয়ে করেছিলেন, তাকে প্রশ্ন করার পর সে বলেছিল, তিনি এখনো অবমাননাকর প্রথম স্বামীর প্রতি অনুভূতি বোধ করছেন।

এটা ঘটার একটা কারণ হলো—মন আপনার ওপর কৌশল চালিয়েছে। সমস্ত নেতিবাচক জিনিসগুলোকে অস্পষ্ট করে ফেলেছে। মাঝেমধ্যে আমরা একে নিস্প্রভ করি, মুছে ফেলি, এবং শুধু ভালো জিনিসগুলো মনে রাখি। এমনকি কিছু নতুন জিনিস তৈরি করে সেটাকে আরও বড় পরিসর দিতে থাকি।

সুতরাং মনোবিজ্ঞানীটি বলেছিলেন, 'একটা তালিকা তৈরি করুন!' সেই মানুষটা কেমন ছিল সেই সবকিছু লিখে রাখুন। এবং যখনই মন আপনার সঙ্গে কৌশল চালানোর চেষ্টা করবে, তখনই তালিকাটি বের করুন এবং পড়ুন। এটা আপনাকে বাস্তবতার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

সাইবার স্টক

আরেকটা উপায়, যেটা আমাদের নিরাময়কে দীর্ঘায়িত করে, সেটা হচ্ছে, এসব মানুষকে আমরা সামাজিক মাধ্যমগুলোতে ঘাঁটাঘাঁটি করি। এটা খুবই মজাদার একটা জিনিস। এই বইটাতে এটা নিয়ে একটা অধ্যায় আছে।

মনে হতে পারে, সাইবার স্টকিং কী এমন ক্ষতি করবে? কিন্তু বাস্তবে এটাকে নিরীহ দেখালেও এটি প্রচণ্ড ক্ষতিকর একটি বস্তু। আপনি আপনার নিরাময়কে অন্তর্ঘাত করছেন সেই মানুষটিকে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার এবং স্ন্যাপচ্যাটে ঘাঁটাঘাঁটি করার মাধ্যমে। আর আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এখন একজন মানুষকে চুপিসারে অনুসরণ করার বিভিন্ন উপায় আছে। এটা একটা বিশাল সমস্যা।

আপনি আপনার বাসায় আরামে বসে থেকে একজনকে অনুসরণ করছেন যেটা কেউ জানে না।

তবে আমি আপনাকে বলছি যে এটি কেমন। এটি একজন মাদকাসক্তের মতো, যে প্রতিদিন একটু একটু করে খানিকটা মাদক গ্রহণ করে। এটি আক্ষরিকভাবে এর মতোই। আমি রূপকভাবে এটি বলছি না। আক্ষরিক মস্তিষ্কে, আপনি যখন কারও সাথে যুক্ত হন, এটি আপনার মস্তিষ্ককে যেভাবে প্রভাবিত করে তা ড্রাগ যেমন মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে, হুবহু সেরকম। হিরোইন এবং কোকেনের মতো।

যখন আপনার একটি সম্পর্ক যেকোনো কারণে ভেঙে যায়, তখন আপনার মধ্যে যে লক্ষণগুলো দেখা যায় তার সত্যিকার অর্থে নেশা থেকে ফিরে এলে যে লক্ষণ দেখা যায় তার মতোই। জৈবিকভাবে প্রত্যাহারের লক্ষণগুলোই আপনার মাঝে দেখা যায়। ডোপামিন নিঃসরণসহ সবকিছুই একই রকমভাবে ঘটে। আপনি মূলত প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত।

সুতরাং সাইবার স্টকিংয়ের মাধ্যমে আপনার ড্রাগের শট নেওয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এটা অনেকটা এরকম যে, আপনি হেরোইনে আসক্ত এবং এখান থেকে সেখান থেকে হেরোইন গ্রহণ করেন।

বাস্তবতা তো এমন যে, আপনি হেরোইনের আসক্তি থেকে সেরে উঠছেন, সুতরাং আপনি তার কাছেও যাবেন না। আপনি যদি মদ্যপ হয়ে থাকেন এবং সেখান থেকে সেরে উঠছেন, তাহলে আপনার মদের কাছে যাওয়া এবং সেখান থেকে এক চুমুক নেওয়াও উচিত নয়। আপনি যদি ধূমপান করা বন্ধ করেন, তাহলে আপনার সিগারেটের ধারেকাছেও যাওয়া উচিত নয়।

কিন্তু মানুষ এটাই করে তাদের সঙ্গে এবং তারা বুঝতে পারে না যে, তারা কী করছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি তো সেই, যে ধারাবাহিকভাবে মাদক নিচ্ছে। সুতরাং তারা কীভাবে মাদকের আসক্তি থেকে বের হয়ে আসবে? উত্তরটি হলো, তারা কখনোই মাদকের আসক্তি থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না। আপনি এই ধরনের মানুষকে দীর্ঘ সময়ের জন্য আটকে থাকতে দেখবেন। কেন? এটা খুবই সাধারণ। আপনি যদি কাউকে দেখেন, যে মাদকাসক্ত এবং ধারাবাহিকভাবে সে মাদক নিয়েই যাচ্ছে, সে কখনোই এটা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না।

সুতরাং আপনাকে এটি একটি আসক্তির মতো দেখতে হবে। আপনাকে এ থেকে বের হয়ে আসার জন্য বদ্ধপরিকর থাকতে হবে। আপনি এই মানুষটিকে অনুসরণ করতে পারবেন না। আপনার তাকে ব্লক করে দিতে হবে। তাকে মুছে ফেলতে হবে। তাদেরকে আনফ্রেন্ড করে দিতে হবে। সবার ওপরে আপনি যদি নিজের ভালো চান, তবে আপনাকে এসব করতে হবে।

দুর্ভাগ্যবশত, আমরা মানুষ হিসেবে এমন অনেক কিছুই করি, যেটা নিজেদের অন্তর্ঘাত সৃষ্টি করে।

আমরা প্রার্থনা করা ছেড়ে দিই এবং শেষ মুহূর্তে কষ্ট ভোগ করি। এর কোনো মানে হতে পারে?

আপনার সমস্ত বন্ধন ভাঙার বিষয়ে খুব কড়ানীতি থাকতে হবে। এটা শুধু আমিই বলছি না। একজন প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানীও একই কথা বলছেন। এমন একজনের সঙ্গে কথা বলুন, যিনি মাদকাসক্তির সঙ্গে মোকাবিলা করেছেন, তাকে জিজ্ঞেস করুন, আপনাকে মাদকাসক্তি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কী করতে হবে? তিনি বলবেন যে, মাদক পাওয়া আপনার জন্য যেন সহজলভ্য না হয়। আপনি এক চুমুক মদ খেতে পারবেন না, যদি আপনি মদ্যপান থেকে বের হয়ে আসতে চান।

অনুধাবন করুন যে, এটি একটি প্রক্রিয়া হতে চলেছে এবং এটি কঠিন হতে চলেছে; কারণ, এটি প্রত্যাহার করতে হবে। আপনি এই থেকে বেরিয়ে আসবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি নিজের নিরাময়কে অন্তর্ঘাত না করছেন। ব্লক করে দেওয়া, আনফ্রেন্ড করে দেওয়া, ডিলিট করে দেওয়া, মোটকথা সমস্ত কিছু। আপনাকে খুবই কঠোর হতে হবে যে, আপনি কখনোই মাদকের কাছে যাবেন না।

সাইবার স্টকিংয়ের একটা বিষয় হলো, আপনি অনলাইনে একটা মানুষের যা-কিছু দেখছেন, সেটা ফটোশপড সংস্করণ। সেখানে অনেক ফিল্টার আছে। আপনি এই মানুষটার সবকিছুর ফটোশপড সংস্করণই দেখছেন।